ও আকাশ ও বিহঙ্গ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে
যাঁরা বিভিন্ন দেশে আমার ভ্রমণ ও
অবস্থানকে সহজ করতে সহায়তা করেছেন
এবং
এখন পরলোকে বাস করছেন।

ভূমিকা

পেশাগত দায়িত্ব পালন, পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমার বেশ কিছু দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এখন থেকে ঠিক ৪০ বছর আগে ১৯৮৩ সালে আমি যখন প্রথমবারের মতো বিদেশে যাই, তখন মনে নানা সংশয় ও শঙ্কা কাজ করেছে। আমার প্রথম গন্তব্য খুব কাছের ছিল না। ঢাকা থেকে কলকাতা-দিল্লি-ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে কমিউনিস্টদের দ্বারা নির্মিত উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত অবরুদ্ধ নগরী পশ্চিম বার্লিন। বিমানযোগে ভ্রমণের এটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। যাত্রা শুরুর আগে এ পথে ভ্রমণ করেছেন, এমন কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে পাইনি। এক এক গন্তব্যে যেতে ভিন্ন ভিন্ন এয়ারলাইনসের ফ্লাইট। ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে দিল্লি, সেখান থেকে জার্মানির লুফথানসায় ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সেখান থেকে প্যানঅ্যামের বিমানে পশ্চিম বার্লিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে পাড়ি দিয়েছি। এক রাত দিল্লিতে, আরেক রাত আকাশে কাটিয়ে সকালবেলায় পশ্চিম বার্লিনের টেগেল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে আসা এক জার্মান ভদ্রলোককে পেয়ে স্বস্তি বোধ করেছি। এর পরের তিন মাসে জার্মানির বেশ কয়েকটি সিটিতে বিমানযোগে যাতায়াত করার সুযোগে বিমানভ্রমণ আমার জন্য সহজ-স্বচ্ছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

কাউকে যদি ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসে, তাকে ঘরে আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পুরোনো দিনের বিশ্বপরিব্রাজক—ইবনে বতুতা, মার্কো পোলো, হিউয়েন সাং, নিকোলাও মানুচিসহ অনেক বিশ্বপরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনি পাঠ করে আমার তা-ই মনে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা স্বাধীনভাবে ভ্রমণের বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। এক দেশের নাগরিক আরেক দেশে যেতে চাইলে তাকে উভয় রাষ্ট্রের আইন ও বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করতে হয়। ভ্রমণের ইচ্ছা জাগলেও হুট করে কোথাও যাওয়া যায় না। তা ছাড়া মানুষের জীবন এত জটিল হয়ে পড়েছে যে প্রয়োজন ছাড়া অনেকের পক্ষেই পরিবার ছেড়ে দীর্ঘ সময় অন্যত্র কাটানো সম্ভব হয় না। এসব সত্ত্বেও এখন অতীতের তুলনায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে মুখ্যত সম্পদশালী দেশগুলোতে শ্রমিকের প্রয়োজনে, যাকে এক অর্থে প্রাচীন দাসপ্রথার আধুনিক রূপান্তর বলা চলে। পুরোনো দিনের দাসত্ব ছিল জবরদস্তি করে শ্রম আদায় করা, কিন্তু এখন শ্রমজীবী মানুষ সঞ্চিত অর্থ, জমিজিরাত বিক্রি করে পরদেশে গিয়ে তাদের শ্রম বিক্রি করার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তাদের আয়ে অনেক দেশের অর্থনীতি টিকে থাকে। বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের এই প্রবাহের কারণে এক অর্থে বিদেশে ভ্রমণ সহজ হলেও স্বল্প সামর্থ্যের মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে ভ্রমণের বাণিজ্যিকীকরণের কারণে। আমার ভ্রমণের অধিকাংশই ছিল কোনো না কোনো সংস্থার আয়োজিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থানকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। সে জন্য মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ভিন্ন দেশ ও সমাজকে জানার সুযোগ পেয়েছি বেশি।

বর্তমান প্রজন্মের কেউ যখন আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করবেন, তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার অধিকাংশ ভ্রমণের সময়কালে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট প্রযুক্তি, ই-মেইল, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, গুগল, ইয়াহু, জিপিএস ইত্যাদি ছিল না। টেলিফোনে এক দেশ থেকে আরেক দেশে কথা বলা ছিল ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও টেলিফোনে দেশে আপনজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। ডাকযোগে চিঠিপত্র পাঠানোই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। সেই পিছিয়ে থাকা সময়ের চিত্র এ সময়ে কল্পনা করে কেউ যদি পেছনের সময়কে বুঝতে চান, তার কাছে আমার ভ্রমণকাহিনি উপভোগ্য হতে পারে। আমার বিবরণীর কিছু অংশ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকেরা তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমার ভ্রমণকাহিনির প্রথম অংশ আমেরিকাকেন্দ্রিক এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ। সে জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠকদের কাছে তাঁর লেখা ভূমিকা উপস্থাপন করতে চাই :

‘বাংলাদেশের সমকালীন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন উদ্ভাবনা, বাহুল্যবর্জিত নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন, দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা এবং সর্বোপরি সম্পাদনার পরিশ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালনেও তাঁর সফলতা আমাদের ইতিপূর্বে মুগ্ধ করেছে। কিছুকাল আগে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ফেলোশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ভ্রমণসূচি সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটিতে লেখকের পর্যবেক্ষণক্ষমতা, স্থান ও কালের বিবরণ এবং যে বিশ্লেষণ ভঙ্গি রয়েছে, তা এককথায় অপূর্ব। প্রবাসে থাকাকালে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সেমিনারে তাঁর মেলামেশা ও অংশগ্রহণের যে চিত্র বইটিতে ফুটেছে, তা যেকোনো পাঠকের জন্যই শিক্ষণীয় বিষয়। তা ছাড়া আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর লেখার গুণে অনেক নীরস তথ্যভারাক্রান্ত বিষয়ও সহজতর সাহিত্যগুণসম্পন্ন বিবরণে পরিণত হয়েছে। এ বইটি শুধু তরুণ উদীয়মান সাংবাদিকদেরই অবশ্যপাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে, এমন নয়। আমার ধারণা, যেকোনো রসজ্ঞ পাঠককেই বইটি অনেক অজানা বিষয়ের স্বাদ গ্রহণে সহায়তা করবে। আমি নিজে বইটি পাঠ করে আমার যৎসামান্য মেধাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি।’

আমেরিকায় আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাড়াও ‘ও আকাশ ও বিহঙ্গ’র বর্তমান সংস্করণে জার্মানি, সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ভারত ভ্রমণের কাহিনি সংযোজিত হয়েছে। আশা করি, ভ্রমণকাহিনিগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, নভেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১১
এখনো দুজন দুজনকে পেতে চাই ১৬৯
পঁচিশ বছর পর স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ১৭৫
করোনার 'হাই রিস্ক এরিয়া' থেকে ফিরে আসা ১৯২
হেমন্তের পোকোনো মাউন্টেন ২০০
আপস্টেট নিউইয়র্কের পর্বতে দুই দিন, দুই রাত ২০৬
পায়ে হেঁটে 'কুইন্সবরো ব্রিজ' অতিক্রম ২১১
সেক্রামেন্টোর ডা. ড্যানের দুই লাখ খতনা ২১৫
সিন্ধু থেকে কাশ্মীর ২১৯
আমাকে ক্ষমা করো, প্রভু ২৪৭
বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও ভারত সন্ধানে ২৬২
হ্যামিলনের বংশীবাদক ৩৪৭

ও আকাশ ও বিহঙ্গ

পালো আল্টো, ক্যালিফোর্নিয়া

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

স্প্যানিশ ভাষায় 'এল কামিনো রিয়েল' অর্থ 'কিংস রোড' বা রাজপথ। ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকো হয়ে যে পথ ধরে স্প্যানিশরা আমেরিকায় এসেছিল তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং সোনা ও রুপা আহরণ করে তাদের দেশকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে, সেই পথ এখনো তাদের স্মৃতি বহন করছে। স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে ছোট শহর পালো আল্টোর মাঝ দিয়ে গেছে প্রশস্ত এই রাজপথ। তার পাশেই একটি হোটেলে আমাকে রেখে গেছেন হ্যারি এন প্রেস। প্রোগ্রামের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এসে লম্বা ঘুম দিয়েছি। রাত ৯টার দিকে ঘুম ভাঙতেই প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করি। মোটেলে খাবারের ব্যবস্থা নেই। অচেনা জায়গায় সন্ধ্যার পর খাবার কিনতে বের হব, এমন ইচ্ছাও হলো না।

ঢাকার কথা খুব মনে পড়ছে। বন্যার পানিতে ভাসছে পুরো ঢাকা, নিচু এলাকাগুলোর বাড়িঘর পানির নিচে। শুধু ঢাকা নয়, প্রায় সমগ্র বাংলাদেশজুড়ে একই দৃশ্য। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের অধিকাংশই ডুবে যাওয়ায় সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আমার নির্ধারিত সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের ফ্লাইটও এর মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশ বিমান এফ-২৭ ও এফ-২৮ ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান দিয়ে অভ্যন্তরীণ কয়েকটি রুট ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। কলকাতা হয়ে

সিঙ্গাপুর পৌঁছাতে পারলেই আমি নির্ধারিত সময়ে আমার চূড়ান্ত গন্তব্য স্যান ফ্রান্সিসকো সিটিতে পৌঁছাতে পারব। বিমানের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী ম্যানেজার মালেক ভাইকে বললাম আমাকে কলকাতার একটি টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে। মালেক ভাই বেশ দৌড়াদৌড়ি করে আমাকে পরদিনের, অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি টিকিট সংগ্রহ করে দেন। সকাল সাড়ে ৭টার ফ্লাইট ধরতে ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বের হতে হলো রাত তিনটায়। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা পৌঁছাতে সাড়ে ৮টা বাজল।

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট সকাল সাড়ে ১০টায় নির্ধারিত ছিল। ফ্লাইটটি বাংলাদেশ বিমানের। আমাদের নিয়ে বিমান আকাশে উড়েছিল বিকেল সাড়ে তিনটায়। এটিই ব্যাংকক হয়ে সিঙ্গাপুর যাবে। পৌনে তিন ঘণ্টায় বিমান ব্যাংকক পৌঁছাল। বহু যাত্রী নেমে গেল ব্যাংককে। বিশাল ডিসি-১০ বিমান একদম ফাঁকা। একজন কেবিন ক্রু জানালেন, মাত্র ৪৯ জন যাত্রী নিয়ে আমাদের সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে। এবার আকাশপথের দূরত্ব আড়াই ঘণ্টার। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম রাত ১১টায়। আমার মূল টিকিটে সিঙ্গাপুরে রাত কাটানোর জন্য হোটেলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের টিকিট বাতিল করায় হোটেলের রিজার্ভেশনও বাতিল হয়েছে। এয়ারপোর্টেই বসে, হাঁটাহাঁটি করে, কফি ও জুস পান করে রাত কাটিয়ে দিলাম। সকালে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট। সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় চার ঘণ্টায় হংকং পৌঁছলাম। সেখানে বিমান থেকে অবতরণ করে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের আরেকটি বিমানে উঠতে হলো। হংকং থেকে টানা সাড়ে ১৩ ঘণ্টার আকাশপথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে স্যান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন গেট দিয়ে বের হলাম, তখন আমাকে কেউ স্বাগত জানাল না। এয়ারপোর্টে কেউ আমাকে রিসিভ করবে বলে জানানো হয়েছিল। কী করব ভাবতে ভাবতে ট্রলিটা ঠেলে একটু ফাঁকা জায়গায় এলাম। বারবার গেটের সামনে ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মিনিট দশেক পর হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়োমতন এক ভদ্রলোক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আগত যাত্রীদের দেখছেন। তার হাতে একটি বোর্ডে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে লেখা STANFORD UNIVERSITY। তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করছেন। উৎসাহিত হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার নাম বললাম। ভদ্রলোক আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার নাম হ্যারি প্রেস। বললেন, 'তোমার দেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে তুমি ঠিক সময়ে আসতে পারবে কি না, আমরা নিশ্চিত ছিলাম

না। লন্ডন থেকে রয়টার্সের কোরিনা স্টোয়েলও জানিয়েছে, তারা ঢাকায় তোমাকে ট্রেস করতে পারছে না। অথচ ইউনাইটেড এয়ারলাইনস বলছে তুমি তাদের কনফার্মড প্যাসেঞ্জার। সে জন্য ছুটে এসেছি এয়ারপোর্টে।'

আমাকে টার্মিনালের গেটে অপেক্ষা করতে বলে তিনি তার গাড়ি আনতে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। আমেরিকায় বসেও তিনি বাংলাদেশে বন্যার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যখন একজন তাদের প্রোগ্রামে অংশ নিতে আসছে, তার এসে না পৌঁছা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকারই কথা। এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও যে আমি দেশ থেকে বের হতে পেরেছি, তাতে তিনি অবাক হয়েছেন। গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে তিনি বললেন, 'আঠারোজনের মধ্যে দুজন ফেলো এখনো আসেনি। তবে কয়েক দিনের মধ্যে ওরা চলে আসবে।' মাঝে মাঝে পথের পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটি মোটেলে পৌঁছলাম। ছোট্ট সুন্দর হোটেল 'রিভিয়েরা মোটর লজ'। আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই কি না, জানতে চাইলেন মি. হ্যারি। তখন কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না। টানা ৫০ ঘণ্টা জার্নি করেছি। শরীর ভেঙে পড়ছিল। ঘুমে দুচোখ বুজে আসছিল। হ্যারি তার বাড়ি ও অফিসের ফোন নম্বর দিয়ে বিদায় নিতেই আমি রুমের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই ফোন করলাম আকরামের কাছে। আকরাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চার বছর যাবৎ ওয়াশিংটনের পুলম্যানে ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আছে। মাস্টার্স করার পর পিএইচডি করছে। ওর সাথে কথা বলার পর নিউইয়র্কে ডিউকে ফোন করলাম। ডিউ ঘরে নেই। আমার হোটেলের ফোন ও রুম নম্বর দিয়ে রাখলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর একটা ফোন এল, খোকন ভাই। ডিউর খোকন মামা। কথা বললাম। আমেরিকায় চলাফেরার অনেক কায়দাকানুন শেখালেন তিনি। ফোন রেখে দেওয়ার পর ক্ষুধা আরো তীব্র মনে হলো। আম্মা একটা প্যাকেটে নারকেলের নাড়ুসহ কিছু শুকনো খাবার দিয়েছেন। ব্যাগ হাতড়ে প্যাকেটটা পেলাম। কিছু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে টিভি অন করলাম। সব কয়টি চ্যানেলে মারদাঙ্গা মুভি চলছে। ভালো লাগল না। এর চেয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমালে কাজে লাগবে।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভাঙল। ফজর নামাজ পড়ে হোটেল থেকে রাস্তায় বের হলাম। রাস্তা শূন্য। দুই-একটা গাড়ি চলছে। দীর্ঘ ঘুমের পর শরীর-মন ঝরঝরে। পরশু এমনি সকালে ঢাকায় ছিলাম। এখন

আমেরিকার রাস্তায় হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে একটি বড় স্টোর পড়ল, এরা বলে গ্রোসারি। হ্যারি গতকাল এটির পাশ দিয়েই আমাকে এনেছেন। বলেছেন, স্ট্যানফোর্ডের সবাই এখানে কেনাকাটা করে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। বছরের কোনো দিন বন্ধ থাকে না। সকালের ফুরফুরে বাতাস আমার ক্ষুধা তীব্র করে তুলেছে। স্টোরে ঢুকে কিছু শুকনো খাবার ও ফল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। নাশতাটা ভালো হলো। এক কাপ চা অথবা কফির কথা ভাবলাম। কিন্তু এখানে কোনোটাই পাব না।

সকাল নয়টার দিকে হ্যারির অফিসে ফোন করলাম। ধরলেন এক মহিলা। 'গুড মর্নিং' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে হ্যারিকে চাইলাম। মহিলা যেন কত দিনের চেনা, 'হাই আনোয়ার। আই অ্যাম র‍্যালি ওয়েনার। হ্যারি টোল্ড মি অ্যাবাউট ইউ। আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইয়োর কল। তা তোমার ভালো ঘুম হয়েছে? হ্যারি তোমাকে আনতে যাবে।' আমি কিছু বলার আগেই কল ট্রান্সফার করলেন হ্যারির কাছে। হ্যারি বললেন, 'গুড মর্নিং, আনোয়ার। আশা করি ভালো ঘুম হয়েছে তোমার। রাতে তোমাকে আর ডিসটার্ব করিনি। ব্রেকফাস্ট করেছ? রেডি হয়ে হোটেলের সামনে দাঁড়াও। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

রেডিই ছিলাম। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হ্যারি এলেন ঠিক পাঁচ মিনিট পর। গাড়িতে উঠলাম। এল কামিনো রিয়েল ডানে মোড় নিয়ে পাম ড্রাইভে পড়লাম। দুপাশে পামগাছের সারি। সে জন্যই রাস্তার এই নাম। পাম ড্রাইভ শেষ হলো ওভালে। ডিম্বাকৃতির বিশাল একটি সবুজ লনের দুপাশ দিয়ে রাস্তা গিয়ে মিশেছে ইউনিভার্সিটির মূল ভবন কোয়াড্রেঙ্গেলে, অর্থাৎ আয়তাকার ভবন এলাকায়। সংক্ষেপে বলা হয় 'কোয়াড'। হ্যারি সব বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ওভালের পাশে গাড়ি পার্ক করে কোয়াডের বাঁ পাশের একটি ভবনে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এটি কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট। চতুর্থ তলায় জন এস নাইট ফেলোশিপ প্রোগ্রামের অফিস, লাউঞ্জ, সেমিনার রুম ইত্যাদি।

হ্যারির অফিসেই বসলাম। প্রথমেই আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন। আমার স্ত্রী-সন্তানদের আপাতত আনব না বলে ক্যাম্পাস হাউজিংয়ের লিজ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করে পাঠাইনি। ফলে ক্যাম্পাসে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা গেছে। আমার জন্য পালো আল্টো, মেনলো পার্কে একটি রুম খোঁজার জন্য হ্যারি বিভিন্ন স্থানে ফোন করতে লাগলেন। ছোট শহর পালো আল্টো, মেনলো পার্কে বাড়িভাড়া তুলনামূলকভাবে বেশি। সামারের ছুটি শেষে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে আসছে। বাড়িভাড়া বাড়ছে। ক্যাম্পাস হাউজিংয়ে সব ছাত্রের আবাসিক সংস্থান নেই। সে জন্য পালো আল্টোসহ

আশপাশের ছোট ছোট শহরগুলোতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে ছাত্ররা। হ্যারি বললেন, 'তোমার যদি ফ্যামিলি আনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমরা এখনো ক্যাম্পাস হাউজিংয়ে ফ্যামিলি অ্যাপার্টমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে পারি। সেশন শুরু হয়ে গেলে অ্যাপার্টমেন্ট পাবে না। তখন বাইরে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। সাত-পাঁচ ভেবে হ্যারিকে অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে বললাম। আমার স্ত্রী-সন্তানদের ভিসাও করিয়ে এসেছি, যাতে আমার অনুপস্থিতিতে ওদের ঝামেলা না হয়। আমি টিকিট পাঠালেই চলে আসবে। অন্তর্বর্তী সময়টায় আমাকে ডরমিটরিতে থাকতে হবে। ঠিক হলো প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট র‍্যালি ওয়েনার আমাকে ডরমিটরিতে পৌঁছে দেবেন এবং হ্যারির বাড়িতে বিকেলে যে ওয়েলকাম পার্টি, সেখানেও দিয়ে আসবেন।

এরপর হ্যারি আমাকে পাশের রুমে র‍্যালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ভদ্রমহিলাই আমার ফোন ধরেছিলেন। র‍্যালি ফেলোশিপ প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমাকে কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে হলো। একটি বড়সড় প্যাকেট পেলাম। তাতে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র। রয়টার্স থেকে পাঠানো চার হাজার ডলারের প্রথম চেক এবং রয়টার্স ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কোরিনা স্টোয়েলের চিঠি। তিনটি চাবিও ছিল—একটি কোয়াড ভবনের সামনের ও পেছনের দরজার, একটি জন এস নাইট লাউঞ্জের, তৃতীয়টি ফেলোদের প্রত্যেকের কিউবিকল রুমের। র‍্যালি আমাকে নিয়ে বের হলেন ক্যাম্পাস দেখাতে। বিশাল ক্যাম্পাস। স্যান্ডস্টোন কেটে কেটে গড়ে তোলা হয়েছে একেকটি ভবন। ক্লাস শুরু হতে এখনো বিশ দিন বাকি। ছাত্রছাত্রী তেমন নেই। প্রথমে গেলাম ওয়েলস ফারগো ব্যাংকে। অ্যাকাউন্ট খুলে চেক জমা দিয়ে কিছু নগদ ডলার তুলে নিলাম। এরপর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ট্রেসিডার ইউনিয়ন, বুকস্টোর, লাইব্রেরি, হুভার ইনস্টিটিউট ইত্যাদি ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল। র‍্যালির সঙ্গেই একটি ক্যাফেতে বসে লাঞ্চ করলাম। স্যান্ডউইচ, পটেটো চিপস ও কেক।

লাঞ্চের পর র‍্যালি বললেন, 'তুমি আরো একটু ঘোরাফেরা করে আমার রুমে চলে এসো। এরপর হোটেল থেকে তোমার লাগেজ নিয়ে ডর্মে পৌঁছে দেব।'

আরো ঘণ্টাখানেক ক্যাম্পাসে হাঁটলাম। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, আমি কি কখনো কল্পনা করেছি, বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসব! আট বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স শেষ করে শিক্ষাজীবনের ইতি টেনেছি। আমি বরাবর মাঝারি মানের ছাত্র।

স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সেরা ছাত্রদের জন্য। বিপুল ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয়। যারা পড়তে আসে, হয় তাদের মোটা অঙ্কের স্কলারশিপ পেতে হয় অথবা আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবারের হতে হয়।

র‍্যালি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুজন হোটেলে গিয়ে বিল মিটিয়ে ব্যাগেজ নিয়ে ডরমিটরিতে এলাম। উইলবার হল। ইউনিভার্সিটির একটি ছাত্রাবাস। সামারের ছুটিতে ছাত্ররা চলে গেলে ফাঁকা পড়ে থাকে। তখন কর্তৃপক্ষ ইউনিভার্সিটিতে কোনো কনফারেন্স, সেমিনার উপলক্ষে এসেছে, এমন লোকদের কাছে ভাড়া দেয়। ডাবল বেডের একটি রুমের প্রতিদিনের ভাড়া ১৪ ডলার, সিঙ্গেল বেডের ২১ ডলার। আমেরিকায় হোটেল খরচের তুলনায় সামান্য। এল কামিনো রিয়েলের যে হোটেলে ছিলাম, এক রাতের জন্য দিতে হয়েছে ৮০ ডলার। উইলবার হলে আমার জন্য বরাদ্দ হলো নিচতলার ১১৬ নম্বর রুম। খুশিই হলাম। র‍্যালিকে বললাম, ১৯৮৩ সালে পশ্চিম বার্লিনের ইয়ুথ হোস্টেল 'কলপিং হাউসে'ও আমার রুম নম্বর ছিল ১১৬। সেখানে সামারের তিনটি স্মরণীয় মাস কাটিয়েছি। উইলবার হলে ডাইনিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। র‍্যালি বললেন, খাওয়ার জন্য আমাকে আধা মাইল হেঁটে যেতে হবে ট্রেসিডার ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ের ক্যানটিনে। মোটামুটি কম দামে ভালো খাবার। র‍্যালি আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেলেন।

বিকেলে হ্যারির বাড়িতে পার্টি। অফিস ছুটি হওয়ার পর র‍্যালি এলেন। আমাকে নিয়ে গেলেন হ্যারির বাড়িতে। র‍্যালি নামলেন না। কারণ, তাকে ইনভাইট করা হয়নি। বেল টিপতেই হ্যারি দৌড়ে এলেন আমাকে রিসিভ করতে। হাতে পিংপং, অর্থাৎ টেবিল টেনিস ব্যাট। খেলছিলেন তুনজির সঙ্গে। তুনজি নাইজেরিয়ার নিউজ ম্যাগাজিন 'দিস উইক'-এর ম্যানেজিং এডিটর। পুরো নাম ওলাতুনজি লার্ডনার, জুনিয়র। তিনিও রয়টার্সের ফেলো। প্রোগ্রামের মোট আঠারোজন সাংবাদিকের মধ্যে আমরা দুজনই রয়টার্সের ফেলো হিসেবে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এসেছি। সে জন্য তার সঙ্গে নৈকট্য বোধ করেছি। বিশাল বাহু প্রসারিত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল তুনজি। আমার চেয়ে বয়সে কয়েক বছরের ছোট হলেও দৈহিক আকারে আমার দ্বিগুণ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সে বলল, তার ম্যাগাজিনে সরকারের দুর্নীতির ওপর একটা রিপোর্টের কারণে তাকে কয়েক দিন কারাগারে কাটাতে হয়েছে, সে জন্য আমার চিঠি পেয়েও উত্তর দিতে পারেনি। তার পাসপোর্টও আটক করেছিল পুলিশ।

একটু পরই এল 'ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার'-এর পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী রিপোর্টার জন ওয়েস্টেনডিক ও তার সুন্দরী স্ত্রী জেনিফার। একে একে এল ব্রাজিলের লুসিয়ানা ভিলাস বোয়াস, ন্যাশভিল টেলিভিশনের অ্যালেন সুমন, সল্টলেক ট্রিবিউনের ন্যান্সি মেলিচ ও তার বয়ফেন্ড স্টিভ। দীর্ঘদিন যাবৎ এটিই প্রোগ্রামের রীতি। অধিকাংশ ফেলো এসে পৌঁছালে ওয়েলকাম ডিনারের আয়োজন করা হয় হ্যারি প্রেসের বাড়িতে। হ্যারির স্ত্রী মার্থাও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন। একদিকে গ্রিলে মুরগির মাংস ঝলসানো হচ্ছে। নাকে এসে লাগছে ক্ষুধাজাগানো পোড়া গন্ধ। আমাদের চিকেন কাবাব এখানে বারবিকিউ। আমরা গোল হয়ে বসে গল্প করছি, চিপস চিবাচ্ছি। সফট ড্রিঙ্কস, বিয়ার ও অ্যালকোহলের ছড়াছড়ি। আমি অ্যালকোহল পান করি না জেনে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করে। বাংলাদেশে হাতের কাছে বিয়ার কিনতে পাওয়া যায় না শুনে সবাই দেশটাকে বসবাসের অনুপযোগী বিবেচনা করল। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনারে পানীয় বলতে আমরা পানি ছাড়া আর কিছু পান করি না, সেটাও একমাত্র তুনজি ছাড়া আর কারো কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না।

ডিনারে বারবিকিউ, ভুট্টাসেদ্ধ ছাড়াও অনেক আইটেম ছিল। অধিকাংশই লবণ ও মসলা ছাড়া শুধু সেদ্ধ। বারবিকিউ আর ভুট্টা মন্দ লাগছিল না। রাত দশটার দিকে পার্টি শেষ হলো। লুসিয়ানা মোটামুটি সুন্দরী, চটপটে এবং কুমারী। লন্ডনে বিবিসির পর্তুগিজ ভাষা বিভাগে বছর দুয়েক অনুবাদের কাজ করেছে। পাশ্চাত্যের কায়দাকানুন ভালোই রপ্ত করেছে, তার নিজের দেশ ব্রাজিলও রক্ষণশীল দেশ নয়। সবাইকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বিদায় নিচ্ছিল সে। লক্ষণটা সুবিধার মনে হলো না। একে একে আমার পালাও আসবে। রুমের প্রায়ান্ধকার কোনার দিকে সরে গেলাম। রুমটি ছোট এবং অল্প কয়জন মানুষের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখা মুশকিল। লুসিয়ানা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই আমি আমার ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে তার হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল এবং দূরত্ব আরো কমিয়ে মুখটা আমার গালের ওপর ঠেকিয়ে চুম্বনের শব্দ তুলল। আমি শিহরিত হলাম। পাল্টা হয়তো আমারও উচিত ছিল ঠোঁটটা ওপর মুখের কোথাও স্পর্শ করা। আমি এতটা সংকুচিত হয়ে উঠেছি যে আমার কান গরম হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু লুসিয়ানা স্বাভাবিক। ডান হাতে একটি আঙুল নিজের গালে ঠেকিয়ে বোঝাল আমার উচিত ছিল ওর ওই স্থানে আমার চুমু দেওয়া। কী করব, বোকার মতো ওর দিকে একটু তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরালাম।

হ্যারি আমাকে ডর্মে পৌঁছে দিলেন রাত দশটার পর। রুমে দুটি বেড থাকলেও আমি একা। কাল তুনজি আমার রুমমেট হবে।

উইলবার হল, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

তুনজি এক রাত আমার সঙ্গে কাটিয়ে চলে গেল। পালো আল্টোর এক বাড়িতে একটি রুম ভাড়া নিয়েছে সে। আরো তিন দিন একা কাটালাম। ট্রেসিডার ইউনিয়নের ক্যানটিনে দুপুরে খাই। বিস্বাদ, অরুচিকর খাবার। ভাত নেই। সবজিসেদ্ধ, সেঁকা পাউরুটি। একটি এক পাউন্ডের রুটি ও কয়েকটি কলা নিয়ে আসি রাতের জন্য। সকালে নাশতার জন্যও কিছুটা রেখে দিই। এরই মধ্যে ঠিক করে ফেলেছি বউ-বাচ্চাদের যত শিগগির সম্ভব নিয়ে আসব। টিকিট কিনে পাঠিয়েও দিয়েছি। সঙ্গে আনতে না পারার জন্য দুঃখ হচ্ছিল। আমার মেয়ে স্কুলে এক মাস পিছিয়ে যাবে। ক্যাম্পাসের পাবলিক স্কুলে ক্লাস শুরু হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে।

তবু চলে যাচ্ছিল সবকিছু। গোল বাধল গোসল করা নিয়ে। প্রথম দিন গোসল করতে গিয়েই দেখলাম কোনো রকম পার্টিশন ও দরজা ছাড়া একটি বাথরুমে চারজন শ্বেতাঙ্গ যুবক গোসল করছে। কারো শরীরে একচিলতে বস্ত্র নেই। পুরোপুরি দিগম্বর। নাভির নিচে দুই পায়ের সংযোগস্থলের ওপরে লালচে কেশদাম, সুপুষ্ট লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ ঝুলছে। পরস্পর কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। শাওয়ারের নলটা হাতে ধরে একজন আরেকজনকে পানি ছিটিয়ে মজা করছে। কারো মাঝে কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই। দৃশ্যটি আমার কাছে নতুন বা অভিনব নয়। পশ্চিম বার্লিনে থাকাকালেও এ ধরনের দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখে সয়ে গিয়েছিল। কলপিং হাউসে বাথরুমের এক কোনায় একটি বাথটাব ছিল ঘেরাও করা। প্রতিদিন দিগম্বরদের মাঝ দিয়ে বাথটাবে গোসল করে ফিরে আসতাম। তা ছাড়া বার্লিনের এক উঁচু ভবনের সপ্তম তলায় অবস্থিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিজম'-এ আমাদের ক্লাসরুমের ঠিক সামনে চারতলার ওপর একটি সুইমিংপুল ছিল। সেখানে নগ্ন পুরুষদের পাশাপাশি নগ্ন নারীরাও সন্তরণ করত। দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলে থাকা পুরুষদের খতনাবিহীন লিঙ্গ এবং প্রেম ও সৌন্দর্যের গ্রিক দেবী আফ্রোদিতির শ্বেতমর্মরের মূর্তির নিখুঁত মসৃণ স্তনের

মতো সুদৃশ্য স্তনশোভিত ও গুরু নিতম্বধারী নগ্ন তরুণীরা আমাদের নয়নপথের পথিক হতো।

আমাদের বন্ধু কালাম ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেল। ছুটিতে দেশে আসার পর বিদেশে ওর অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে সে আরো ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিল। সে যে ডরমিটরিতে থাকত, প্রথম দিন পায়খানা করতে গিয়ে ওর মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা। এক সারি কমোডে অনেকগুলো ছাত্র বসে পায়খানা করছে। কোনো পার্টিশন নেই। পাশাপাশি সবাই বসেছে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে। সে অবস্থায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলছে। এ দৃশ্য দেখে কালাম দৌড়ে পালিয়েছিল সেখান থেকে। কিন্তু পেটে চাপ নিয়ে কতক্ষণ থাকা যায়! আমাদের এলাকায় প্রবাদ আছে, 'হাগায় মানে না বাগা' (বাঘ)। অতএব, লজ্জা ঝেড়ে ফেলে তাকেও সবার সামনে উদোম নিতম্ব কমোডে স্থাপন করতে অভ্যস্ত হতে হয়েছে। আমি অভ্যস্ত হতে পারিনি। গোসল না করে কয় দিন থাকা যায়! একটা উপায় বের করেছিলাম। গভীর রাতে ডরমিটরির সবাই যখন ঘুমে। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ, অর্থাৎ রাত দুইটা-তিনটার সময় উঠে গোসল করতে শুরু করলাম। ফলে শ্বেতাঙ্গ দিগম্বরদের মধ্যাঙ্গ আমার চোখকে আর পীড়িত করত না।

একই ডর্মে ছাত্রছাত্রীদের সহাবস্থান। ঠিক পাশাপাশি নয়। হলের এক তলায় ছাত্র, আরেক তলায় ছাত্রী। তবে আন-অফিশিয়ালি একই রুমে ছাত্র ও ছাত্রী থাকে, এমন ঘটনা অনেক। ফলে যা ঘটার তা-ই ঘটে। এসব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। তবে যৌনব্যাধি যাতে ছড়িয়ে না পড়ে অথবা কোনো মেয়ে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ না করে, সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। টয়লেটে ভেন্ডিং মেশিনে কনডম পাওয়া যায় প্রতিটি ডর্মেই। পঁচিশ সেন্টের দুটি কয়েন ফেললেই একটি কনডম বেরিয়ে আসে। ভেন্ডিং মেশিনের গায়ে লেখা আছে, 'সেফ সেক্স, অ্যাভয়েড এইডস'।

সামার শেষে ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু ক্যাম্পাসে ফিরে আসছে, কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ডর্মের প্রবেশপথে রেখে দিয়েছে মেডিকেল সেন্টারের নিরাপদ যৌন-সংস্পর্শের নিয়মাবলি-সংক্রান্ত লিফলেট। তাতে বিভিন্ন কন্ট্রাসেপটিভের ব্যবহারবিধি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সুলভে কোথায় এসব কন্ট্রাসেপটিভ পাওয়া যাবে, তার ঠিকানাও আছে। ইউনিভার্সিটির মেডিকেল সেন্টার ছাত্রদের কনডম ব্যবহারে বরং বেশি আগ্রহী। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। যৌনকর্মে কেবল স্পর্শসুখের সামান্য ব্যাঘাত ঘটে বলে লিফলেটে উল্লেখ করা হয়েছে। মেডিকেল সেন্টারের সেক্স কাউন্সেলিং

অফিসারের কাছে কেউ গেলে দশটা করে কনডম মাগনা পাওয়া যায়। সেখানেই আবার সেলস কাউন্টারে দশটি কনডমের দাম নেয় দুই ডলার। ড্রাগ স্টোর বা ফার্মেসিতে এক ডজনের প্যাকেট রকম ও ফ্লেভারভেদে পাঁচ থেকে দশ ডলার পর্যন্ত। চরম মুহূর্তে হাতের কাছে কনডম পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য মেডিকেল সেন্টার ডরমিটরিতে কনডমের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে ভেন্ডিং মেশিন বসিয়ে। লিফলেটে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে, কনডমের ব্যবহার আশঙ্কাজনকভাবে কম এবং এর ফলে ক্যাম্পাসে এইডসের আশঙ্কা বাড়ছে।

কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ম্যারিয়ন লিওয়েনস্টেইনের সাথে সেদিন ছাত্রছাত্রীদের একত্রে বসবাসের প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম। প্রফেসর ম্যারিয়ন জন এস নাইট ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সিলেকশন কমিটির সদস্য। তিনি বললেন, 'এখন আমেরিকার অবক্ষয়ের যুগ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বর্তমানে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে। এ দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার চেতনা এতটাই প্রবল যে চোখের সামনে এসব দেখেও কেউ কাউকে কিছু বলে না। কারণ, তাতে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়।' ক্যাম্পাসের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের সহাবস্থান সম্পর্কে তিনি বললেন, 'বছর পঞ্চাশেক আগে অনেক ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। এরপর একই ডর্মের এক অংশে ছাত্র, আরেক অংশে ছাত্রীরা থাকত। এখন স্ট্যানফোর্ডের ডর্মগুলোতে এক তলায় ছাত্র, আরেক তলায় ছাত্রীরা থাকে। অনেক ভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রী পাশাপাশি রুমেই থাকে। কিছুদিন পর হয়তো এখানেও পাশাপাশি, এমনকি একই রমে ছাত্রছাত্রীর সহাবস্থান শুরু হবে।'

তুনজি চলে যাওয়ার পর চতুর্থ দিন সকালে আমার রুমে বোর্ডার হয়ে এল শ্রীলঙ্কার এক ছেলে, সামান। ওয়াশিংটন স্টেটে সিয়াটেলের কোনো এক ভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শেষ করে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এসেছে গ্র্যাজুয়েট কোর্স করতে। তার সাবজেক্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। কাছাকাছি দেশের ছেলে। ভাবলাম ভালোই হলো। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাইত সে। আমিও শ্রীলঙ্কার অজানা দিকগুলো জানতে চাইতাম। ভালোই চলছিল। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না। বছর চারেক যাবৎ সে আমেরিকায়। আচার-আচরণে আমেরিকান প্রভাব সুস্পষ্ট। একদিন সে গোসল করে রুমে এসেই কোমরে প্যাঁচানো টাওয়েলটা খুলে আমার সামনেই ন্যাংটা হয়ে সর্বাঙ্গে ক্রিম মাখতে শুরু করল। বয়সে অন্তত বছর দশেকের বড় হওয়ায় উপমহাদেশীয় রীতি অনুযায়ী ওর কাছে যে সমীহ আমার প্রাপ্য ছিল, এভাবেই সে তা পরিশোধ করল।